আধুনিক অর্থবিজ্ঞানের পুরোধা

পুনর্জিৎ রায়চৌধুরী

“I never cease to be impressed—indeed astonished—by the reach of Smith’s ideas across the centuries.”

—‘অ্যাডাম স্মিথ অ্যান্ড দ্য কনটেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড’, অমর্ত্য সেন

বেআক্কেলে এক স্কচম্যান

অষ্টাদশ শতকের সাতের দশকের স্কটল্যাণ্ড। শীতের এক ঝকঝকে সকালে এডিনবরার একটি বাজারে টাটকা মাছের পশরা সাজিয়ে বসে মাছবিক্রেতা এক স্কটিশ মহিলা। হঠাৎ লক্ষ করলেন, সুন্দর পোশাক পরা, রীতিমতো সুপুরুষ, বছর পঞ্চান্ন-ষাটের এক ‘স্কচম্যান’—হাত দুটো পিছনে, মাথাটা আকাশের দিকে তোলা, চোখ আধবোজা—এগিয়ে আসছেন তাঁর দোকানের দিকে। কিন্তু দোকানের সামনে এসে থামার বদলে স্কচম্যানটি প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সাজিয়ে রাখা মাছগুলির ওপর! আর্তনাদ করে উঠলেন মাছ বিক্রেতা, “হায়, হায়! এই বেআক্কেলে লোকটাকে পথে বেরতে দিয়েছে কে? গায়ে আবার দামি পোশাক চাপানো হয়েছে!” প্রায় একই কাণ্ড করেছিলেন এই স্কচম্যানটি তার কয়েকদিন আগেও। সে বার সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন হয়ে বাজারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফল বিক্রেতা এক দরিদ্র মহিলার অস্থায়ী দোকানঘরে সজোড়ে ধাক্কা খেয়ে নিজে তো পপাত ধরণীতল হয়েই ছিলেন, উলটে ফেলেছিলেন গোটা দোকানঘরটিকেও!

যারা এই স্কচম্যানটিকে ভাল করে চিনতেন, তাঁরা অবশ্য এই ঘটনাগুলি জেনে আদৌ বিস্মিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ এই ধরণের কাণ্ড ঘটানোয় আত্মমগ্ন মানুষটির যে জুড়ি মেলা ভার, সেটা ততদিনে প্রতিষ্ঠিত সত্য! শোনা যায়, একবার কী একটা জরুরি দলিলে দস্তখত করার সময়, স্কচম্যানটি নিজের সই বেমালুম ভুলে গিয়ে তাঁর আগে যিনি সেই দলিলে সই করেছিলেন, তাঁর সইটাই নকল করে বসেছিলেন! আরেকবার, স্কটল্যাণ্ডের ডলকিথ শহরে অনুষ্ঠিত এক নৈশভোজে, এই স্কচম্যানটি তৎকালীন রাজনৈতিক কোনও বিষয়ে বক্তৃতা দিতে উঠে স্কটল্যান্ডের এক রাষ্ট্রনায়কের আদ্যশ্রাদ্ধ করেছিলেন এটা না খেয়াল করেই যে সেই নৈশভোজে সেই রাষ্ট্রনায়কের একজন নিকট আত্মীয় উপস্থিত!

যদি বলি এই আত্মমগ্ন, কিঞ্চিত উদ্ভট এবং সামাজিকভাবে অপ্রতিভ স্কচম্যানটিই ছিলেন গত সহস্রাব্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও চিন্তাবিদ অ্যাডাম স্মিথ, যাকে নির্দ্বিধায় ‘আধুনিক অর্থবিজ্ঞানের পুরোধা’ বলা যায়—তাহলে হয়তো একটু অবাক হবেন, তাই না? অবশ্য নাও হতে পারেন যদি আপনার জানা থাকে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের সেই বিখ্যাত উক্তিটি —পাগল না হলে ‘জিনিয়াস’ হওয়া যায় না!

উত্থানের ঊষালগ্ন

অ্যাডাম স্মিথের জন্ম ১৭২৩-র প্রথমার্ধে স্কটল্যাণ্ডের অপূর্ব সুন্দর বন্দর-শহর কারকাল্ডিতে। স্মিথের জন্ম তারিখ সঠিক ভাবে জানা না গেলেও, এটা জানা যায় যে ৫ই জুন ১৭২৩-এ ব্যাপ্টাইইজ় করা হয় তাঁকে। স্মিথের জন্মের আগেই প্রয়াত হন তাঁর বাবা, যিনি শুল্ক বিভাগের কমিশনার ছিলেন। স্মিথের বড় হয়ে ওঠা তাই সম্পূর্ণভাবে তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানে। দৃঢ়চেতা ও মানসিকভাবে শক্তিশালী মহিলা বলতে যা বোঝায়—স্মিথের মা ছিলেন তা-ই।

স্মিথ যে সময়টায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, স্কটল্যান্ডের ইতিহাসে সেই সময়টাকে 'স্কটিশ এনলাইটমেন্ট'-এর সূচনাকাল বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তার কারণ সেই সময়ে (অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়কাল অবধি) স্মিথ ছাড়াও বহু গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক-ইতিহাসবিদ-সমাজবিদ-সাহিত্যিক-চিত্রকর-সংগীতজ্ঞ স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যারা পরবর্তীকালে তাঁদের কাজের মাধ্যমে কেবল স্কটল্যাণ্ডকেই নয়, গোটা পাশ্চাত্য সমাজকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হেনরি হোম (জন্ম ১৬৯৬), ডেভিড হিউম (জন্ম ১৭১১), হিউ ব্লেয়ার (জন্ম ১৭১৮), উইলিয়াম রবার্টসন (জন্ম ১৭২১), অ্যাডাম ফার্গুসন (জন্ম ১৭২৩), জেমস হাটন (জন্ম ১৭২৬) এবং জোসেফ ব্ল্যাক (জন্ম ১৭২৮)।

সাত বছর বয়সে কারকাল্ডির দু-কামরার বার্গ স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয় স্মিথকে। সেখানে বছর সাতেক কাটান স্মিথ। বার্গ স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রায় শুরু থেকেই স্মিথের শিক্ষাগ্রহণে অসীম ক্ষমতা, প্রচণ্ড মেধা, ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা ও নিদারুণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে চোদ্দ বছর বয়সে স্মিথ ভর্তি হন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে (অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে চোদ্দ বছর বয়সটাকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার প্রকৃষ্ট বয়স বলে বিবেচনা করা হত)। আতলান্তিক মহাসাগরের অন্য প্রান্তে অবস্থিত ব্রিটিশ কলোনিগুলির সঙ্গে ব্যবসা করে গ্লাসগো শহরের ব্যবসায়ীরা তখন রীতিমতো ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। তার প্রভাবেই গ্লাসগো শহরটি সেই সময় অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী বলে বিবেচিত হত।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ই স্মিথ বেশ কিছু শিক্ষকের সংস্পর্শে আসেন যাদের চিন্তাভাবনা তাঁর ওপর প্রভূত প্রভাব ফেলে। এঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন দার্শনিক ফ্রান্সিস হাচেসন (১৬৯৪-১৭৪৬)—যাকে তাঁর চৌম্বক ব্যক্তিত্ব এবং বাগ্মিতার জন্য তাঁর ছাত্ররা শ্রদ্ধার সঙ্গে "the never to be forgotten Hutcheson" বলে উল্লেখ করত—তেমনই ছিলেন গণিতবিদ রবার্ট সিমসন (১৬৮৭-১৭৬৮) এবং বৈজ্ঞানিক রবার্ট ডিক (মৃত্যু ১৭৫১)। এখানেই স্মিথ যুক্তি, নাগরিক স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতার মতো দার্শনিক ধারণাগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন। একই সঙ্গে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন মানবজাতির রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কেও। দর্শন ও রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে পড়তে পড়তে স্মিথের সামনে যেন এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়; এক তীব্র বাসনা তাঁর মধ্যে তৈরি হয় মানব প্রকৃতিকে আরও গভীর ভাবে বোঝার এবং চিরে চিরে দেখার।

১৭৪০-এ গ্লাসগো থেকে অক্সফোর্ডশায়রে পৌঁছন স্মিথ, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'স্নেল এক্সিবিশান' স্কলারশিপ পেয়ে স্নাতোকত্তর স্তরে ভর্তি হন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বেলিয়াল কলেজে। ৭ই জুলাই ১৭৪০ থেকে ১৫ই অগস্ট ১৭৪৬—এই ছ'বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই অক্সফোর্ডেই কাটান স্মিথ। কিন্তু অক্সফোর্ডে কাটানো সময়টা তাঁর জীবনে কোনও ছাপই ফেলেনি। বস্তুত, বেলিয়াল কলেজে না তিনি প্রভাবিত হন কোনও বিশেষ অধ্যাপকের দ্বারা, না তাঁর সঙ্গে সখ্যতা গড়ে ওঠে এমন কারুর সঙ্গে যিনি তাঁর চিন্তা-চেতনাকে ঋদ্ধ করতে পেরেছিলেন। বরং ডেভিড হিউমের (যিনি পরবর্তীকালে স্মিথের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন) 'আ ট্রিটাইস অফ হিউমন নেচার' গ্রন্থটি পড়ার 'অপরাধে' একবার অক্সফোর্ডের কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা সাংঘাতিকভাবে তিরস্কৃত হতে হয় স্মিথকে! বহু বছর বাদে 'বিশ্বের কিছু প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে স্মিথ লিখেছিলেন '[these universities are] sanctuaries in which

exploded systems and obsolete prejudices found shelter and protection, after they had been hunted out of every other corner of the world'। স্মিথের এই সিদ্ধান্তে আসার পিছনে যে অক্সফোর্ডে কাটানো তাঁর ছ'টি বছর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সেটা সংশয়াতীতভাবে বলা যায় (উল্লেখ্য, 'কিছু প্রচীন বিশ্ববিদ্যালয়' সম্পর্কে স্মিথের মতামত পড়ে স্বাভাবিকভাবেই যারপরনাই রুষ্ট হয়েছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক স্যামুয়েল জনসনের মতো অক্সফোর্ডের বহু প্রাক্তনী)!

যে 'স্নেল এক্সিবিশন' স্কলারশিপের সৌজন্যে স্মিথ অক্সফোর্ডে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, সেই স্কলারশিপের শর্ত অনুযায়ী, অক্সফোর্ডে শিক্ষা সম্পন্ন করে, স্কলারশিপ প্রাপকদের স্কটল্যাণ্ডে ফিরে এসে স্কটিশ এপিস্কোপিয়াল চার্চে যোগ দিতে হত ধর্মযাজক হিসাবে। স্মিথের অবশ্য ধর্মযাজক হওয়ায় কোনও বাসনা ছিল না। তাই ১৯৪৬-এ অক্সফোর্ডের পাট চুকিয়ে স্কটল্যাণ্ডের কারকাল্ডিতে ফিরে এলেও, স্কটিশ এপিস্কোপিয়াল চার্চে যোগ দেননি তিনি।

এর দু'বছর বাদে, ১৭৪৮-এ, প্রকাশিত হয় স্মিথের প্রথম লেখা। সেটা অবশ্য কোনও প্রবন্ধ নয়, নির্বাসিত এক কবির কাব্যসংগ্রের ভূমিকা (তা-ও আবার অস্বাক্ষরিত)! সেই বছরই, হেনরি হোম (লর্ড কেমস্)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রেটরিক', 'বেল লেট্রা' (অর্থাৎ রচনাবিদ্যা) এবং 'প্রোগ্রেস অফ অপিউলেন্স'—এই বিষয়গুলির ওপর স্মিথ পাবলিক লেকচার দিতে শুরু করেন। লেকচারগুলি স্পন্সর করেছিল 'ফিলোসফিকাল সোসাইটি অফ এডিনবরা'। স্মিথ অসামান্য বাগ্মী ছিলেন, এ কথা বলা না গেলেও, লেকচারগুলি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে আগামী দু'বছরের শীতেও স্মিথকে পুনরায় এডিনবরায় হাজির হতে হয় একই লেকচার দেওয়ার জন্য।

১৭৫০-এর শেষের দিকে, মাত্র সাতাশ বছর বয়সে, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে লজিক এবং রেটরিক পড়ানোর জন্য চেয়ার প্রফেসর হিসাবে নিযুক্ত হন স্মিথ। মা-কে নিয়ে থাকতে শুরু করেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত একটি বাড়িতে। সম্ভবত ১৭৪৮ থেকে ১৭৫০ পর্যন্ত এডিনবরায় প্রদত্ত স্মিথের লেকচারগুলির বিপুল সাফল্য গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মিথের নিযুক্তির পিছনে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। ১৭৫২-এ 'ফিলোসফিকাল সোসাইটি অফ এডিনবরা'-র সদস্য নির্বাচিত হন স্মিথ। তার পরের বছর, অর্থাৎ ১৭৫৩-এ, আরও একটি নতুন পালক যুক্ত হয় স্মিথের টুপিতে—গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক দর্শনের চেয়ার প্রফেসরের প্রয়াত হলে, সেই শূন্য পদে নিযুক্ত হন স্মিথ। উল্লেখ্য, ১৭৪৬-এ, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, এই পদেই নিযুক্ত ছিলেন স্মিথের অন্যতম প্রিয় শিক্ষক ফ্রান্সিস হাচেসন। তাই বলাই যায়, যে আসন এক সময় অলংকৃত করেছিলেন শিক্ষক, সেই একই আসনে ছাত্রের নিযুক্তিতে যেন একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়।

১৭৫০ থেকে ১৭৬৩, এই তেরো বছর স্মিথ কাটান গ্লাসগোতেই। এই তেরোটা বছর সম্পর্কে পরবর্তীকালে স্মিথ তাঁর প্রথম জীবনীকার ডুগাল্ড স্টুয়ার্টকে বলেছিলেন '...by far the most useful, and therefore, as by far the happiest and most honourable period of my life'। আসলে, এই সময়টায় স্মিথ যে কেবল সফল অধ্যাপক হিসাবেই পরিচিতি পেয়েছিলেন তা তো নয়, ১৭৫৯-এর এপ্রিলে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ তাঁকে বৃহত্তর সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছিল দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং প্রবন্ধকার হিসাবেও।

দর্শনশাস্ত্রের নতুন নক্ষত্র

স্মিথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটির শিরোনাম ছিল 'দ্য থিয়োরি অফ মরাল সেন্টিমেন্টস্'। প্রকাশক—এডিনবরার এ মিলার, এ কিনকেইড এবং জে বেল। ৫৫১ পৃষ্ঠার পাঁচ পর্বে বিভক্ত এই গ্রন্থটির মূল্য প্রতিপাদ্য ছিল কেবলমাত্র 'রিজ়নিং' (বা যুক্তি) আমাদের আচরণ কিংবা সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়; অন্যদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি

আমাদের নিজস্ব আচার-আচরণ নির্ধারণে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে ব্যাপকভাবে অবদান রাখে। স্মিথ যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে আমাদের প্রায় সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং আচরণ আমাদের 'কনশান্স' (বা বিবেক) দ্বারা নির্ধারিত হয়, যা অন্যদের আচরণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা কিংবা বিচারের মাধ্যমে বিকশিত হয়। এই ধারণাগুলি আমাদের আত্ম-সচেতনতাকে প্রসারিত করে, আমাদের চারপাশের মানুষেরা কীভাবে আমাদের আচার-আচরণ উপলব্ধি করে তা বোঝার জন্য সক্ষম করে তোলে, যার ফলে আমাদের বিবেকের জন্ম হয়। স্মিথ একে 'সিম্পাথি' (বা সহানুভূতি) হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। কীভাবে নৈতিক বিচারের ক্ষমতা মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়, তা বোঝার চেষ্টা করতে গিয়েই স্মিথ এই তত্ত্ব উদ্ভব করেন।

একটি উদাহরণ দিলে স্মিথের তত্ত্বটি ভাল করে বোঝা যাবে। ধরুন আপনার বন্ধু একটি পুরষ্কার জিতেছেন এবং তা নিয়ে তিনি এমনভাবে গর্ব করছেন যা আপনার এবং অন্য অনেকের কাছে বেশ অসংবেদনশীল মনে হচ্ছে। আপনি এই আচরণের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হলেন এবং এটিকে অভদ্র মনে করলেন। যদি, অন্য কোনো অনুষ্ঠানে, আপনি একটি পুরষ্কার পান, আপনি—আপনার বন্ধুর মতোই— আপনার কৃতিত্বের জন্য গর্ব বোধ করবেন এবং অন্যদের সঙ্গে সেই আনন্দের খবরটি ভাগ করে নিতে চাইবেন (যা একেবারেই স্বাভাবিক)। কিন্তু, যেহেতু আপনি আপনার বন্ধুর পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর অবিবেচক অসংবেদনশীল আচরণ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যা আপনার 'কনশান্স' অপছন্দ করেছে, সেহেতু আপনার নিজের আচরণে আপনি অনেক বেশি সংবেদনশীলতার পরিচয় দেবেন। আপনি আপনার কৃতিত্বে গর্বিত হবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু একই সঙ্গে নম্র থাকবেন এবং যারা পুরস্কার পাননি তাঁদের প্রতি থাকবেন শ্রদ্ধাশীল। স্পষ্টতই, এক্ষেত্রে আপনার আচার-আচারণের মূল নির্ধারক 'কনশান্স' এবং 'সিম্পাথি', 'রিজ়নিং' নয়।

প্রকাশের পর 'দ্য থিয়োরি অফ মরাল সেন্টিমেন্টস্' প্রশংসা কুড়িয়ে নেয় ডেভিড হিউম এবং এডমান্ড বার্কের মতো বহু বিশিষ্টজনের। শুধু তা-ই নয়, গ্রন্থটির প্রকাশ স্মিথকে এতটাই জনপ্রিয় করে তোলে যে স্নাতক স্তরে পাঠরত বিভিন্ন দেশের বহু ছাত্রছাত্রী, তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে শুরু করে অ্যাডাম স্মিথকে শিক্ষক হিসাবে পাওয়ার আশায়! দ্বিধাদ্বন্দ্বহীনভাবে বলা যায়, গ্রন্থটির সাফল্য পাশ্চাত্য সমাজে স্মিথকে দর্শনশাস্ত্রের নতুন নক্ষত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে যার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৭৬২-তে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ 'ডক্টর অফ লজ়' (এলএলডি) উপাধিটি প্রদান করে।

এই সাফল্যের তরঙ্গে ভেসেই যেন ১৭৬৩-র শেষের দিকে 'ব্রিটিশ চান্সেলার অফ দ্য এক্সচেকার' চার্লস টাউনসেণ্ডের (যার সঙ্গে স্মিথের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ডেভিড হিউম) তরফ থেকে একটি অভিনব প্রস্তাব এসে পৌঁছয় স্মিথের কাছে। প্রস্তাবটি হল এই—চার্লস টাউনসেণ্ডের সৎপুত্র 'ডিউক অফ বাক্লিউ' হেনরি স্কটের সঙ্গে তাঁর টিউটার হিসাবে স্মিথ ইউরোপ মহাদেশ সফরে যান। বিনিময়ে স্মিথ পাবেন প্রতি বছর তিনশ পাউন্ড বেতন (যা তাঁর বর্তমান বেতনের দু'গুণ), ভ্রমণ খরচ, এবং অবসরের পরে প্রতি বছর তিনশো পাউন্ড পেনশন। তখনকার সময়ের নিরিখে রীতিমতো লোভনীয় প্রস্তাব, বলাই বাহুল্য! ইউরোপ সফরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল স্মিথের বহুদিন ধরেই। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাইরের যে পৃথিবী, বাসনা ছিল সেই পৃথিবীটাকে আরও কাছ থেকে দেখার এবং বোঝারও। তাই টাউনসেণ্ডের প্রস্তাব ফেরাতে পারেন না স্মিথ—ডিউক অফ বাক্লিউের টিউটার হিসাবে ইউরোপ মহাদেশ সফরে যেতে সম্মত হন তিনি। প্রস্তাবটির শর্ত অনুযায়ী প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেও গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ থেকে স্মিথের ইস্তফা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না কোনও। তবু নতুন পদ গ্রহণ করে, ১৭৬৪-র মার্চ মাসে সতেরো বছরের ডিউক অফ বাক্লিউয়ের সঙ্গে লণ্ডন থেকে ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার পর, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ইস্তফাপত্র পাঠান স্মিথ।

ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া স্বত্বেও, দুর্ভাগ্যবশত, স্মিথের ইউরোপ সফর সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। এর কারণটি জানিয়েছেন ডুগাল্ড স্টুয়ার্টঃ '...he preserved no journal of this very interesting period of his history; and such was his aversion to write letters, that I scarcely suppose any memorial of it exists in his correspondence with his friends'। শুধু এটুকু জানা যায়, টুলুস, প্যারিস এবং জেনিভার মতো পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন শহর সফরকালে স্মিথ একদিকে যেমন তাঁর নতুন গ্রন্থের পরিকল্পনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, অন্য দিকে তেমনই সমৃদ্ধ হয়েছিলেন বহু চিন্তাবিদ, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ এবং কৃষি তাত্ত্বিকদের সঙ্গে সাক্ষাতে। এঁদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম—ভল্টেয়ার, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, ক্লদ-অ্যাড্রিয়েন হেলভেটিয়াস এবং অ্যান-রবার্ট-জ্যাক টার্গট।

১৭৬৬-র শেষের দিকে ডিউক অফ বাক্লিউর ছোট ভাই হিউ, যিনি ডিউকের সফরসঙ্গী ছিলেন, হঠাৎই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই প্রয়াত হন। এই ঘটনার ফলে ভেঙে পড়া ডিউক তড়িঘড়ি ইংল্যাণ্ড ফিরে আসেন। স্মিথের ইউরোপ সফরে অসময়ে নেমে আসে যবনিকা। ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে স্মিথ 'দ্য থিয়োরি অফ মরাল সেন্টিমেন্টস্'-এর নতুন সংস্করণ নির্মাণে মাস ছয়েক ব্যয় করেন লণ্ডনে। তারপর তিনি ফিরে যান স্কটল্যাণ্ডের কারকাল্ডিতে, তাঁর মায়ের কাছে।

স্কটল্যাণ্ডে ফিরে স্মিথ পুরোদমে তাঁর নতুন গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দেন। এবং, শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও সত্যি, তার পরের দশ বছরের প্রায় পুরোটাই ব্যয় করেন এই গ্রন্থটি রচনায়! ১৭৭৬-র ৯ই মার্চ প্রকাশিত হয় দু'খণ্ডের এই গ্রন্থটি। নামপত্রে লেখা—'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, by Adam Smith, LL.D. and F.R.S. (Fellow of the Royal Society), Formerly Professor of Moral Philosophy in the University of Glasgow'। জীবনের দশটি অমূল্য বছর যে 'ওয়েলথ অফ নেশনস্' রচনার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন স্মিথ, নির্দ্বিধায় বলা যায়, সেটা বৃথা যায়নি। ভাবীকাল যে 'ওয়েলথ অফ নেশনস্'-কে ম্যাগনাম ওপাসের স্বীকৃতি দেয় কেবল তা-ই নয়, এই গ্রন্থটিই যে গুরুত্বপূর্ণ 'অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন' হিসাবে অর্থনীতিকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করে—তা আজও, গ্রন্থটি প্রকাশের আড়াইশো বছর বাদেও, এক বাক্যে মেনে নেন পৃথিবীর সমস্ত প্রতিথযশা অর্থনীতিবিদ।

অদৃশ্য হাতের কেরামতি

ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, ইউরোপ জুড়ে এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল যাকে 'মারকেনটাইলিজ়ম' (বা বাণিজ্যবাদ) বলা হয়ে থাকে। ব্যবস্থাটি মূলত যে ভাবনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সেটি হল, একটি দেশের সম্পদ এবং অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির একটিই মাত্র উপায়—রপ্তানি বৃদ্ধি এবং আমদানি হ্রাস। মারকেনটাইলিস্টদের মতে, দেশের সম্পদ হল তার অর্থের 'স্টক' বা ভাঁড়ার যা নির্ধারিত হয় মূল্যবান ধাতু (সোনা কিংবা রূপো) অধিগ্রহণের মাধ্যমে। এই যুক্তিতে, দেশ থেকে অর্থের নির্গমন—আমদানির জন্য ব্যয় করা অর্থ-সহ—মানে জাতীয় সম্পদের ক্ষয়। অন্য দিকে, রপ্তানির মধ্যে দিয়ে অর্থ লাভের মানে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি। যেহেতু কেবল দেশের সরকারই তার বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করে আমদানি বৃদ্ধি এবং রপ্তানি হ্রাস নিশ্চিত করতে পারে, সেহেতু 'মারকেনটাইলিজ়ম' ব্যবস্থায় জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে সরকারের গুরুত্ব সীমাহীন। বলাই বাহুল্য, 'মারকেনটাইলিজ়ম'-এর তত্ত্ব মেনে আমদানি হ্রাসের জন্য সরকার আমদানির ওপর কড়া হারে শুল্ক চাপাত বলে মুক্ত বাণিজ্য ভীষণভাবে ব্যাহত হত। শুধু তা-ই নয়, 'মারকেনটাইলিজ়ম' উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণকেও অনুপ্রাণিত করত।

‘ওয়েলথ অফ নেশনস্’-এ স্মিথ ‘মারকেনটাইলিজ়ম’-এর মূল তত্ত্বটিকে সরসারি আক্রমণ করেন। স্মিথ লেখেন, দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যে সরকারের হস্তক্ষেপ করে বিধিনিষেধ আরোপের প্রয়োজন একেবারেই নেই। তিনি দাবি করেন, জাতীয় সম্পদ আদৌ মূল্যবান ধাতু অধিগ্রহণের দ্বারা নির্ধারিত হয় না; বরং তা নির্ধারিত হয় শ্রম বিভাজনের দ্বারা। শ্রম বিভাজন মানুষকে যে কাজে সে দক্ষ সেই কাজে বিশেষায়ণের সুযোগ করে দিয়ে তার নিজের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় যার ফলে সমাজে সম্পদ সৃষ্টি হয়। কিন্তু শ্রম বিভাজনের ফলে একটিই কাজে মানুষ দক্ষ হয়ে ওঠে বলে, তাকে বাজারের ওপর নির্ভর করতেই হয় তার প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবাগুলির জন্য যা সে নিজে উৎপাদন করতে পারে না। তাই অর্থনীতিতে শ্রম বিভাজনের মাত্রা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল বাজারের পরিধির ওপর। বাজারের পরিধি বৃদ্ধি পেলে, শ্রম বিভাজনের সুযোগ বাড়ে। মুক্ত বাণিজ্য যেহেতু বাজারের পরিধি বৃদ্ধি করে, সেহেতু বলাই বাহুল্য শ্রম বিভাজনের সুযোগ বাড়ে মুক্ত অর্থনীতিতে। এবং স্মিথের মতে শ্রম বিভাজনই যেহেতু নির্ধারণ করে জাতীয় সম্পদ, মুক্ত বাণিজ্যর ফলে মানুষের সম্পদ এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেতে বাধ্য কোনও রকম সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই।

বস্তুত, ‘ওয়েলথ অফ নেশনস’ পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় যে স্মিথ মনে করতেন একটি অর্থব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে চলার জন্য এবং সেই অর্থব্যবস্থা দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সরকারের ভূমিকা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং মানুষের স্ব-স্বার্থের জন্য স্বাভাবিক প্রবণতাই অর্থব্যবস্থার সুষ্ঠু ভাবে চলা এবং দেশকে সমৃদ্ধির পথে চালিত করা নিশ্চিত করে। স্মিথ গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন, শেষ পর্যন্ত মানুষ তাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত ও পছন্দের-অপছন্দের মাধ্যমে, নিজেদের অজান্তেই, সমষ্টির (বা সমাজের) সামগ্রিক স্বার্থ তুলে ধরে। কী ভাবে সেটা সম্ভব?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ‘ম্যাকবেথ’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে স্মিথ invisible hand বা অদৃশ্য হাতের তত্ত্ব উত্থাপন করেন ‘ওয়েলথ অফ নেশনস্’-এ। তিনি বলেন এক অদৃশ্য হাত সমাজে মানুষের স্ব-স্বার্থ পূর্ণ করে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থপূরণ ঘটায় (এবং সরকারের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ানোয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে)। অদৃশ্য হাত বলতে আসলে স্মিথ বোঝাতে চেয়েছিলেন বাজারের শক্তিকে। এটি এমন বহু ঘটনার সমষ্টি যা স্বাভাবিকভাবে ঘটে যখন ভোক্তা এবং উৎপাদকরা একে অপরের সঙ্গে আদানপ্রদান কিংবা বেচাকেনায় নিয়োজিত হন। স্মিথ দেখিয়েছিলেন এই অদৃশ্য হাত কিংবা বাজারের শক্তি অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম এবং বিতরণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। দুর্লভ পণ্যের জন্য সব সময়ই বেশি দাম দিতে প্রস্তুত থাকি আমরা। একইসঙ্গে, দুর্লভ পণ্য সরবরাহ করে বেশি মুনাফা হয় বলে উৎপাদকরাও সেগুলি উৎপাদন করতে বেশি মূলধন বিনিয়োগ করে। সুলভ পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আবার উল্টো। সুলভ পণ্যের বাজারদর কখনই খুব বেশি হয় না। সেই কারণেই সুলভ পণ্য সরবরাহ করে বেশি মুনাফার সম্ভাবনা কম—অতএব উৎপাদকরা সেগুলি উৎপাদন করতে বেশি মূলধন বিনিয়োগ করে না। অর্থাৎ, একটি পণ্য কতটা দুর্লভ—তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় পণ্যটির বাজারদর, এবং সেই বাজারদর, পালাক্রমে, নির্ধারণ করে সেই পণ্যটির উৎপাদনে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ। এর থেকেই পরিষ্কার, সরকারি দিকনির্দেশ ছাড়াই, কেবল অদৃশ্য হাতের কেরামতিতে—অর্থাৎ বাজারের শক্তির ওপর নির্ভর করে—অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুঁজির বরাদ্দ মসৃণভাবে ভাবে হয়, অর্থব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে চলে এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়। অতএব, স্মিথের তত্ত্ব অনুযায়ী, ‘ওয়েলথ অফ নেশন’ বৃদ্ধির জন্য, সরকার নয়, বাজারই আসল। এবং, তাই বাজার সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি যার জন্য প্রয়োজনীয় মুক্ত বাণিজ্য।

এখানে দু’টো কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এক, ‘ওয়েলথ অফ নেশনস্’-এ স্মিথ কখনোই বলেন না, সরকার গুরুত্বহীন। বরং স্মিথ বলেন, পরিকাঠামো নির্মাণে, প্রশাসন চালানোয় এবং উদ্ভাবনে উৎসাহ যোগানোয় সরকারের

ভূমিকাই প্রধান। দুই, স্মিথ জানতেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি বৃহদাংশ বাজার-নির্ভর হলে শ্রমিকদের শোষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, শ্রমিকদের একজোট হয়ে প্রতিবাদের অধিকার থাকাটা ভীষণ জরুরি।

গ্রন্থ হিসাবে 'ওয়লেথ অফ নেশনস্' সাফল্য লাভ করেছিল—এ কথা দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন ভাবে বলা যায়। গ্রন্থটিতে স্মিথ একবারে এক নতুন অর্থনৈতিক পথের হদিশ দিয়েছেন, মনে করেছিলেন বহু বিশিষ্টজন। অনেকে আবার এও মনে করেছিলেন, স্মিথের তত্ত্বের ভিত্তিতে একেবারে নতুন ধরণের সরকার গঠিত হতে পারে যে সরকার চলবে বলপ্রয়োগ, রাজকীয় বিশেষাধিকার, ধর্মীয় উদ্দীপনা কিংবা সমাজের কিছু বিশেষ বর্গের স্বার্থ চরিতার্থ করার ভিত্তিতে নয়, মুক্ত মানুষের নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার তীব্র আকাঙ্খার ভিত্তিতে। 'ওয়েলথ অফ নেশনস্' গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাই প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক-অর্থনীতিবিদ এডমান্ড বার্ক সঠিকভাবেই লিখেছিলেন "it is a complete analysis of society, beginning with the 1st rudiments of the simplest manual labor, and rising by an easy natural predation to the highest attainments of mental powers. In which course not only arts and commerce, but finance, justice, public police, the economy of armies, and the system of education, are considered and argued upon"।

ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর

১৭৭৮-এ, স্কটল্যান্ডের কাস্টমস কমিশনারের পদ গ্রহণ করে এডিনবরার ক্যাননগেটের পানমুর হাউসে স্মিথ তাঁর মাকে (যিনি ১৭৮৪-এ প্রয়াত হন) নিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। জীবনের এই নতুন পর্বে সপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে চার দিনই স্মিথ ব্যস্ত থাকতেন আমদানিকৃত পণ্যের ওপর শুল্ক আদায় এবং স্কটল্যাণ্ডে চোরাচালান দমন করার কাজে। আর বাকি সময়টুকু ব্যয় করতেন 'ওয়েলথ অফ নেশনস'-এর একটি নতুন ও সুলভ সংস্করণ রচনায়। উল্লেখ্য, ১৭৮৪-এ প্রকাশিত 'ওয়েলথ অফ নেশনস'-এর এই সংস্করণটিতে স্মিথ একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত করেন যেখানে তিনি সরাসরি আক্রমণ করেন ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য এবং সরকার চালনার ধরনধারণকে।

'ওয়েলথ অফ নেশনস'-এর পর আর বড় কোনও লেখা লেখেননি স্মিথ। তবে তাঁর যে লেখার ইচ্ছে ছিল সেটা হলফ বলা যায়। মৃত্যুর বছর পাঁচেক আগে, ১৭৮৫-তে, এক ফরাসী সাংবাদিককে স্মিথ বলেছিলেন, "two other great works upon the anvil; the one is a sort of Philosophical History of all the different branches of Literature, of Philosophy, Poetry and Eloquence; the other is a sort of theory and History of Law and Government. The materials of both are in a great measure collected, and some Part of both is put into tolerable good order. But the indolence of old age, tho' I struggle violently against it, I feel coming fast upon me, and whether I shall ever be able to finish either is extremely uncertain"। স্মিথের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। যদি হত, পৃথিবী যে 'দ্য থিয়োরি অফ মরাল সেন্টিমেন্টস্' এবং 'ওয়েলথ অফ নেশনস'-এর মতো আরও দু'টি 'মাস্টারপিস' পেত, সেটা বলাই বাহুল্য।

১৭ই জুলাই ১৭৯০, ৬৭ বছর বয়সে, বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর প্রয়াত হন স্মিথ। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় এডিনবরার ক্যাননগেট চার্চইয়ার্ডে। মৃত্যুশয্যায় যথেষ্ট কীর্তি রেখে যেতে না পারার জন্য আক্ষেপ করেছিলেন স্মিথ, "I

meant to have done more; and there are materials in my papers, of which I could have made a great deal. But that is now out of the question."

মৃত্যুর ছ-দিন আগে স্মিথ তার বন্ধুদের অনুরোধ করেছিলেন, কয়েকটি বাদ দিয়ে তাঁর সমস্ত অপ্রকাশিত রচনা যেন নষ্ট করে ফেলা হয়। স্মিথের অনুরোধ রেখেছিলেন তাঁর বন্ধুরা। স্মিথের চোখের সামনেই আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল তাঁর বহু অপ্রকাশিত প্রবন্ধের পান্ডুলিপি ও লেকচার নোটস্। স্মিথের যে রচনাগুলি তাঁর জীবিতাবস্থায় অপ্রকাশিত ছিল এবং যেগুলিকে স্মিথ নষ্ট করার নির্দেশ দেননি, সেগুলি সংকলিত করে ১৭৯৫-তে প্রকাশিত হয় স্মিথের শেষ গ্রন্থ 'এসেজ় অন ফিলজ়ফিকাল সাবজেক্টস'। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রথম প্রবন্ধটি, যার বিষয় জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস, স্মিথ রচনা করেছিলেন 'দ্য থিয়োরি অফ মরাল সেন্টিমেন্টস'-এরও আগে বলে অনেকে মনে করেন।

কেন স্মিথ চেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর বেশির ভাগ অপ্রকাশিত লেখা জনসমক্ষে না আসুক? সঠিক ভাবে বলা মুস্কিল। তবে সিদ্ধান্তটি যে হঠাৎ করে নেওয়া নয় সেটা বোঝা যায় ১৭৭৩-এ—যখন কর্মসূত্রে বেশ কিছুদিনের জন্য স্কটল্যান্ড ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছিলেন স্মিথ—তখন ডেভিড হিউমকে তাঁর লেখা একটি চিঠির এই অংশটি পড়লেইঃ 'As I have left the care of all my literary papers to you, I must tell you, that except those which I carry along with me, there are none worth the publication, but a fragment of a great work, which contains a history of the astronomical systems...All the other loose papers which you will find...I desire to be destroyed without any examination'।

তিনশো বছর পেরিয়ে

অ্যাডাম স্মিথের জন্মের তিনশো বছর পূর্ণ হল। জন্মের তিন শতক বাদেও তাঁর জীবন এবং কাজ নিয়ে যখন চর্চা হচ্ছে, বিতর্ক হচ্ছে (অনেকের মতে স্মিথ অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের প্রবক্তা ছিলেন), তখন বোঝাই যাচ্ছে অ্যাডাম স্মিথ আজও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু কেবল প্রাসঙ্গিক বললে কিছুই বলা হয় না। আধুনিক অর্থনীতি যে কাঠামোর ওপর মূলত দাঁড়িয়ে আছে— যে কাঠামোর ভিত্তি ব্যক্তির স্বাধীনতা, শ্রম বিভাজন, বাজারের শক্তি, প্রতিযোগিতা, মুক্ত বাণিজ্য—সেই কাঠামোর প্রায় পুরোটাই নির্মিত হয়েছে স্মিথের 'ওয়েলথ অফ নেশনস'-এর ভিত্তিতে। কেবল তা-ই নয়, এই মুহূর্তে চর্চার শিখরে থাকা 'বিহেভিওরাল ইকনমিক্স' (বা আচরণমূলক অর্থনীতি) নামক অর্থবিজ্ঞানের যে শাখাটি—যেটিকে অর্থনীতিবিদরা 'নতুন' শাখা বলে ভাবতেই পছন্দ করেন—তার মূল তত্ত্বগুলির অনেকগুলি যে ১৭৫৯-এ প্রকাশিত স্মিথের 'দ্য থিওরি অফ মরাল সেন্টিমেন্টস' গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেটা দেখিয়েছেন আমেরিকার এক দল অর্থনীতিবিদ কয়েক বছর আগে অর্থনীতির একটি বিখ্যাত জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে!

১৯৭৭-এ, আমেরিকার স্বাধীনতার দু'শো বছর উপলক্ষে রচিত একটি প্রবন্ধে, ফেডেরাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ রিচমণ্ডের অর্থনীতিবিদ রবার্ট হেটজেল অ্যাডাম স্মিথ সম্পর্কে লিখেছিলেন, "his ideas have become so thoroughly absorbed into our intellectual heritage that they are no longer identifiable as having originiated with Adam Smith"। সত্যিই তাই, যে অর্থবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া পৃথিবীর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিবর্তন বোঝাটা কার্যত অসম্ভব, সেই অর্থবিজ্ঞানের একেবারে অণু-পরমাণুতে মিশে রয়েছে অ্যাডাম স্মিথের ভাবনা, দর্শন। অতএব, অ্যাডাম স্মিথের কাছে আধুনিক বিশ্বের ঋণ অশেষ—এ কথা স্বীকার করে নিতে আমাদের এক বিন্দুও সংশয় থাকার কথা নয়।